ডাক-বাংলোর চৌকিদার

রঞ্জন প্রসাদ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

বেহালার সুর □ ৭
মর্গানসাহেবের অর্গান □ ১৫
মিশিরজির কম্বল □ ২৮
সেকেন্ড মাস্টারমশাই □ ৩৬
হিরো □ ৪৩
রক্তকমল □ ৫০
লক্ষ্যভেদ □ ৭২
কবির কেরামতি □ ৭৯
ভয় □ ৮৪
বাবুয়ানার বোঝা □ ৯৩
ভূতের লক্ষণ □ ৯৮
ডাক-বাংলোর চৌকিদার □ ১০৩

বেহালার সুর

ফুটবলের ঘামঝরানো বিকেল পার করে পার্কের রেলিং-ঘেঁষা কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোর মাথায় গ্রীষ্মের গা-ধোওয়া সন্ধের হালকা অন্ধকার নেমে এল। পাখিদের ঘরে ফেরার কাকলি সবে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। এমন সময় দূর থেকে বাতাসে ভেসে এল একটা সুমধুর আওয়াজ, বেহালায় সুর তুলেছে কেউ। ক্ষীণ আওয়াজ ক্রমশ স্পষ্ট হতে হতে যখন রিকশার ঠুন ঠুন ঘণ্টা আর ফেরি-করা ফুলওয়ালার বেলফুল জুঁইফুলের গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে গলির সন্ধের বাতাসটাকে সুরের নেশায় জমিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে, তখন পাড়ার সবাই জেনে যায় যে, বৃদ্ধ বেহালাবাদক আজ এ-পাড়ায় এসেছে।

ধীর পায়ে যন্ত্রটা বাজাতে বাজাতেই সে পথ চলে। কালো টুপির নীচ থেকে বেরিয়ে আসা লম্বা কোঁকড়ানো কাঁচাপাকা চুল, আর একমুখ দাড়ি, স্বপ্নালু চোখে তার বিষণ্ণ মুখে এক অদ্ভুত নির্লিপ্ত হাসি। শতচ্ছিন্ন কোট-পাতলুন আর তালিমারা হাঁ-করা বুটজুতো তার সারা বছরের পরিধান, শুধু শীতকালে একটা মাফলার যোগ হয়। বাঁ হাতে বেহালাটি সযত্নে থুতনিতে চেপে সে ডান হাতে ছড় টেনে চলে, আর এক সুরের জাদুতে ভরে ওঠে তার চারপাশের বাতাস। রাস্তার পাশের বাড়িগুলোর দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই সুর ছড়িয়ে যায় অনেক দূর। সেই সুরের টানে তার পেছনে পথ চলে একটা ছোট্ট ভিড়, যেটা ক্রমশ বাড়তে থাকে। বেশিরভাগই পাড়ার গরিব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা, বড়ো বড়ো কৌতূহলী চোখ নিয়ে ওরা তার সঙ্গ নেয়। পার্কের কাছে এসে সে উঁচু রেলিং-এ পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়। মাথার টুপিটি খুলে উলটে রাখে তার সামনের ফুটপাথে, আর বাজিয়ে চলে মুখে একটিও কথা না বলে। পেছনের ভিড়টা তার সামনে গোল হয়ে জমতে থাকে। যাতায়াতের পথে মানুষ একটু থেমে শোনে সে বাজনা। বাড়ির জানলাগুলো খুলে যায়, বারান্দাও ভরে ওঠে সদ্য ঘরে-ফেরা বাবু, রান্নাঘর-ফেলে-আসা গিন্নিমা আর হোমটাস্কের খাতা সরিয়ে রাখা ছেলেমেয়েদের ভিড়ে, কদাচিৎ বা সে ভিড়ে উঁকি মারে তাদের প্রাইভেট টিউটরেরও রাশভারি মুখ — সে বাজনার এমনই টান। ক্রমে সামনের টুপিটা ভরে ওঠে সিকি-আধুলি,

কখনো বা একটাকা, দু'টাকায়। পার্কের গাছপালা ঝোপঝাড়ে রাতের অন্ধকার গভীর হয়ে নামে। রাস্তার আলোটাও হয়ে ওঠে রহস্যময়। বাজনা শেষ হলে নীরবে টুপির পয়সাগুলো কুড়িয়ে পকেটে ভরে সে একবার ওপরে তাকিয়ে চারপাশের বাড়িগুলোর উদ্দেশে দু'হাত তুলে একটি নমস্কার জানায়। তারপর বেহালাটি পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। রাতের পার্ক সুনসান পড়ে থাকে। অদ্ভুত এই মানুষটিকে কখনো কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখেনি কেউ, কিছু চাওয়া তো দূরের কথা। সে যে কোথাকার মানুষ বা তার নামটিও যে সঠিক কী, তাও জানে না কেউ। কেউ বলে অগাস্টিন, কেউ বলে অগস্ত্য, খুদেরা নাম দিয়েছে 'বেহালাবুড়ো', সেটাই চলে আসছে। যদিও চুল-দাড়ি আর চেহারায় তার সঠিক বয়স ধরা অসম্ভব, তা পঞ্চাশ থেকে ষাট-পঁয়ষট্টি যে কোনোটিই হতে পারে।

কিছুদিন হল পাড়ায় এসে বাসা নিয়েছেন এক বিখ্যাত গায়িকা। দারুণ তাঁর নামডাক। যাতায়াতের পথে চোখে পড়ে তাঁর দামি ফ্ল্যাটের ঝুলবারান্দা থেকে এলাহি বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ড— 'মুম্বই-বাংলার হৃদয়-কাঁপানো, সাড়াজাগানো কিন্নরকণ্ঠী ব্লোহট শিল্পী — মিস কুহেলি'। তারপরেই একদম চাঁচাছোলা বাণিজ্য —'অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা' .... ইত্যাদি। লোকজনের ভিড় সবসময় লেগে থাকে। শান্ত পাড়াটায় চাঞ্চল্য জাগে নিস্তরঙ্গ পুকুরে একটা ঢিল পড়লে যেরকম ঢেউ ওঠে, সেইরকম। রেডিও, টিভি, জলসা, সিরিয়াল, রেকর্ডিং— একদম লাগাতার প্রোগ্রাম। সকাল থেকেই ফোনের ক্রিং-ক্রিং চলতে থাকে। মিস কুহেলি কিন্তু ফোন ধরেন কদাচিৎ। রিসিভার তুলে তাঁর বকলমে একজন সেক্রেটারি কথা বলেন, বুকিং, দরাদরি, সবই তাঁর হাতে। একইসঙ্গে দোকান বাজার ধোপা বা মুদি দোকানের বিল তাও থাকে তাঁর কড়া তত্ত্বাবধানে। সবাই তাঁকে বলে 'সামন্ত', যদিও তাঁর পুরো নাম বা আদত পরিচয় জানা যায় না কখনোই। তাই খাতায়-কলমে সেক্রেটারি হলেও তাঁর সম্বন্ধে চাপা কানাঘুষোয় তাঁর অস্তিত্বটিও কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে থাকে, ওই কুহেলি নামটির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বোধ করি। ক্রমে পাড়ার সকলের গা-সওয়া হয়ে যায়। পাড়ার ক্লাবে পুজো-পিকনিকে মোটা চাঁদা দেন ওঁরা। কখনো ফাংশনের ফ্রি-পাশ। উঠতি মস্তানেরা বশংবদ হয়ে থাকে। নতুন গানের মহড়ার দিন হাজিরা দেয়। সেদিন চলে এক এলাহি ধুমধাড়াক্কা। ও বাড়িতে কতরকম দেশি-বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের মেলা বসে যায়। তাদের সাড়ে বত্রিশ রকম

আওয়াজে পাড়ার পিলে চমকে ওঠে। বঙ্গো, কঙ্গো, প্যাড। কীবোর্ড, গিটার, সিন্থেসাইজারের শব্দতরঙ্গের সঙ্গে কিন্নরকণ্ঠী মিস কুহেলির কর্ডলেস মাইক হাতে নাচগানের মহড়া শুরু হতেই বাইরের রোয়াকের সামনে আরম্ভ হয় উঠতি ব্রেক নাচিয়েদের কসরতের উদ্দাম মহড়া। বিনি পয়সায় পড়ে-পাওয়া মোচ্ছব। এক্ষেত্রে অবশ্য কিছু বাড়ির জানলা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ক্রমে এটাও গা-সওয়া হয়ে যায়। যেমন পাড়াটার নামও মুখে মুখে পালটে গিয়ে দাঁড়ায় কুহেলিপাড়া। এহেন উত্তেজনার হিড়িকে বৃদ্ধ বেহালাবাদক যে কতদিন পাড়ায় আসে না, সেটাও ক্রমে ভুলে যায় লোকে।

ধীরে ধীরে সময় কাটে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ পেরিয়ে শীত আসে। পার্কের গাছগুলোর পাতা ঝরে যায়। শীর্ণ ডালপালায় কাঁপন ধরায় শীতের বাতাস। ক্রিকেট ম্যাচের শেষে পার্কে ভারি হয়ে নামে শীতের গোধূলি। দুর্গাপুজো কালীপুজোর প্যান্ডেলের বাঁশের গর্তগুলো ভরাট হয়ে যায়। এবারের সেরা আকর্ষণ মিস কুহেলির হাই - ফাই অনুষ্ঠানের গল্প মুখে মুখে চর্বিতচর্বণ হতে হতে একসময় ফিকে হয়ে আসে।

এমন সময় একদিন শীতের সন্ধের ভারি হাওয়ায় দূর থেকে ভেসে আসে সেই পুরোনো বেহালার আওয়াজ, চেনা ছড়ের টানের শব্দ। বুকে এসে ধক্ করে ধাক্কা দেয় সেই করুণ স্মৃতিমেদুর সুর, আর মনটা একসঙ্গে অব্যক্ত আনন্দ-বিষাদে টনটন করে ওঠে। আমি আর ঘরে থাকতে পারি না। ছোটোদের মতোই রাস্তায় নেমে পড়ি। সেই কবেকার গল্পে-পড়া হ্যামলিন শহরের পাইড পাইপারের বাঁশির মতোই আওয়াজটা আমাকে টেনে নিয়ে চলে। মনে মনে স্থির করি, আজই ওর সঙ্গে আলাপ জমাব, জেনে নেব ওর হাল-হদিস। এভাবে ওকে হারিয়ে যেতে দিয়ে ফের ওরই বাজনা শোনার ইচ্ছে বুকে নিয়ে হা-পিত্যেশ অপেক্ষার এই শেষ।

পাড়ার গলির মুখে পার্কের কাছাকাছি এসে পা-টা থমকে গেল আমার। বেহালাবাদককে ঘিরে ধরেছে ছায়ামূর্তির মতো পাড়ার মস্তানের দল, রাস্তার আবছা আলোয় ওদের কয়েকজনকে চিনতেও পারলাম। নিঃশব্দে পায়ে পায়ে এগিয়ে একটু উৎকর্ণ হতেই ওদের কথাগুলো কানে এল। ওদের বক্তব্য আজ কুহেলির রিহার্সালের দিন, অর্কেস্ট্রার সবাই প্রায় হাজির, আর মাত্র দু'একজন এসে গেলেই মহড়া শুরু হয়ে যাবে। তাই আজ এ-পাড়ায় অন্য কোনো ধরনের আওয়াজ বরদাস্ত করা হবে না। করলে অশান্তি বাধবে। শেষের কথাগুলো বলার সময় হুমকিটা বেশ প্রকট হল। ভালোয় ভালোয় তাকে বিদেয় হওয়ার সদুপদেশও দিল একজন।

যতক্ষণ এত কথা চলছিল ততক্ষণ বেহালাটা তার একমুখ-দাড়িতে-ঢাকা থুতনিতে লাগিয়েই নীরবে শুনছিল সে। সেই নির্লিপ্ত মুখ, ডানহাতে ধরা ছড়। এইবার বেহালা নামিয়ে সে চোখ মেলে সোজা হয়ে তাকাল, তীক্ষ্ণ মর্মভেদী সেই দৃষ্টি ক্ষীণ রাস্তার আলোতেও চোখে পড়ল আমার, আর বিস্মিত করল আমাকে। এত জ্যোতি কোথায় লুকিয়ে ছিল এই নিষ্প্রভ ছন্নছাড়া চেহারায়! নির্বিকার কণ্ঠে পরিষ্কার বাংলায় বলল সে, "কুহেলি, সে কে?"

এতদিনে এই প্রথম তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমার মতো ওরাও কেউ এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাই একটু যেন হকচকিয়ে গেল সবাই। তারপরেই দলের পাণ্ডা গোছের একজন অট্টহাস্য করে উঠতেই সবাই সেই হাসির হররায় যোগ দিল। পাণ্ডার গলার আওয়াজটা চেনা ঠেকল, ঠাহর করে দেখি, সে গোপেশ্বর, সংক্ষেপে গুঁপো। বড়োসড়ো তার গোঁফের কারণে অথবা নামের অপভ্রংশ করে, এটাই ওর চালু নাম। প্রোমোটারদের সিমেন্ট-বালি পাহারা দিতে ওর ডাক পড়ে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সে বলল, "এ আদার ব্যাপারি যে আবার জাহাজের খবর নিচ্ছে রে। আরে, কুহেলিদি বিরাট শিল্পী, এ পাড়ার গর্ব, বুঝলি?"

"অত কথায় কাজ কী গুঁপোদা", আর একজন পরামর্শ দিল। "আজ আর কোনো বাড়িতে ভিক্ষেটিক্ষে হবে না, ওকে আর একদিন আসতে বলে দে।"

এবারে তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে লোকটি প্রতিবাদ করল, "ভিক্ষে? আমি তো কখনো কারও কাছে ভিক্ষে চাইনি, ভিক্ষের কথা আসছে কেন? আমি বেহালা বাজাতে ভালোবাসি, আর কিছু লোক তা শুনতে ভালোবাসেন, তাঁরা খুশি হয়ে যা দেন, আমি তাই আমার পারিশ্রমিক মনে করে নিই। কেন, আপনার পাড়ার শিল্পীরা কি পারিশ্রমিক নেন না?"

"বটে, যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা। জানিস, ওঁর এই শহরেই রেট ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার টাকা, বাইরে ডবল।" বলে আস্তিন গুটিয়ে তেড়ে এল একটি ছোকরা। আমি আর থাকতে পারলাম না, বিপদ হতে পারে জেনেও রুখে দাঁড়ালাম। দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, "এ তোমাদের কী ক্ষতি করেছে যে সবাই মিলে একে হেনস্থা করছ? আর এভাবে একজন পরিণত বয়সের মানুষকে তুই-তোকারি করার অধিকারই বা তোমাদের কে দিয়েছে?" বলেই তাঁর দিকে ফিরে বললাম, "আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি বাড়িতে বসে আজ আপনার বাজনা শুনব। সেটা তো এদের এক্তিয়ারে নয়, দেখি কে কী বলে।"

আমরা এ-পাড়ায় বেশ পুরোনো, তায় মেজোকাকা একজন জবরদস্ত আইনজীবী, তাই আমার ওই মূর্তি দেখে ওরা মুখ চাওয়াচাউয়ি করল। তারপরেই দ্বিগুণ